OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 107 - 116
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 107 - 116
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

সৈকত রক্ষিতের ছোটগল্প ‘পাঘা’ : জীবনের এক অদৃশ্য শিকল

রঞ্জিত কালিন্দী
গবেষক
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: rjkalindi94@gmail.com

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
নিরুপায়তা, জীবন, দরিদ্র কৃষক, নিয়ন্ত্রণ, সংসার, পাঘা, শিকল।

Abstract
সাম্প্রতিক কালের এক উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক হলেন সৈকত রক্ষিত। মূলত দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তবর্তী গ্রামীণ সাধারণ মানুষের খেটে-খাওয়া জীবনের প্রসঙ্গ নিয়েই তাঁর সাহিত্যজগৎ সমৃদ্ধ। বিশেষত তাঁর ছোটগল্পের মূল বিষয় পুরুলিয়া জেলার প্রান্তিক এলাকার মানুষের জীবনচিত্র। লেখক সৈকত রক্ষিতের ‘পাঘা’ শিরোনামবিশিষ্ট ছোটগল্পটি সেইরকমই একটি গল্প, যেখানে পুরুলিয়া জেলার এক দরিদ্র কৃষকের জীবনযন্ত্রণার ছবি উপস্থাপিত হয়েছে। একজন কৃষক হওয়া সত্ত্বেও তার জীবনের নিরুপায়তা তাকে কীভাবে সার্বিকভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে, তারই এক মর্মস্পর্শী চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে।

দরিদ্র কৃষক শামাউন সংসারের চারটি পেটের সম্বৎসরের আহার-সংস্থানের কাজে যেন নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। স্ত্রী-সন্তানসহ চারজনের সেই সংসার তার জীবনের একমাত্র বোঝা। তাদের জন্য তাকে সারাজীবন কাজ করে যেতে হবে। এর থেকে তার কোনো মুক্তির উপায় নেই। লেখক সৈকত রক্ষিত তার এই আবদ্ধ জীবনের বাস্তবতাকে একটি ভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

পুরুলিয়ার এক ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অংশ হল গ্রামীণ কৃষকদের জন্য আয়োজিত পশু কেনাবেচার হাট। সেই হাটের উপস্থাপন প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে লেখক শামাউনের জীবনের নানান স্তরকে উন্মোচিত করেছেন।

দরিদ্র শামাউন তার সংসার চালায় নিজের জমির উপর নির্ভর করে। নিজের জমিতে ফসল ফলিয়ে যে উপার্জন হয়, সেটাই তার সংসার সংগ্রামের একমাত্র হাতিয়ার। সেই জমিতে লাঙল চালানোর জন্য যে দুটি গরুর প্রয়োজন, তার একটি মারা গেলে বাড়িতে থাকা বাছুরসহ একটি গাইকে বিক্রি করে অপর একটি জোতের গরু কিনতে চায়। তাই সে ঝালদার হাটে উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই গরু বিক্রি করতে গিয়ে সে উপযুক্ত মূল্য পায় না। নিজের লোকসান করে কম দামে গরুটি বিক্রি করে সে ঘরে ফেরে। কিন্তু তখন তার সামনে নতুন সমস্যা দেখা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 107 - 116
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দেয়— এই সামান্য অর্থ দিয়ে সে আরেকটি গরু কোথায় পাবে? তার জীবনের এই নিরুপায়তাই তখন প্রকট হয়ে ওঠে।

দরিদ্র কৃষক শামাউনের মতো মানুষের জীবনে নিরুপায়তা যেন তাদের নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে বেড়ায়। নিজে কৃষক হলেও তাদের জীবনে এমন দিনও আসে, যখন দিনের পর দিন না খেয়ে কাটাতে হয়। আবার সেই সঙ্গে সংসারের প্রয়োজনও মেটাতে হয়। তখন তার কাছে চারপাশের জগতের আর কোনো অর্থ থাকে না। জীবনের আনন্দ, কৌতূহল, সুখ-দুঃখ— সবকিছুকেই এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অনুভব করতে হয়। বাইরের কোনো সৌন্দর্য তখন আর তার কাছে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে না; সাংসারিক প্রয়োজনই হয়ে ওঠে তার একমাত্র অবলম্বন।

গৃহপালিত পশুকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেমন একটি দড়ি বা পাঘার সাহায্য নেওয়া হয়, তেমনই সংসার জীবনের প্রয়োজনীয়তা শামাউনের মতো কৃষকের জীবনকে এক অদৃশ্য পাঘার ন্যায় নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে বেড়ায়। 'পাঘা' গল্পে লেখক এই প্রতীকের মধ্য দিয়ে দরিদ্র কৃষক জীবনের অসহায়তা, সংগ্রাম, আবদ্ধতা এবং জীবনের নির্মম বাস্তবতাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন।

Discussion

সৈকত রক্ষিতের জন্ম ১৯৫৪ সালে। বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রবেশ করেন সত্তরের দশকে। এরপর ১৯৮৩ সালে 'আকরিক' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে নিজের স্বতন্ত্র পরিচয়টিকে প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ভাষার প্রবর্তন করেন। তিনি মূলত পুরুলিয়া জেলার প্রান্তিক মানুষদের নিয়েই তাঁর সাহিত্যের জগতটিকে সমৃদ্ধ করতে প্রয়াসী। পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতির প্রতি লেখকের একটি পৃথক আগ্রহ লক্ষ করা যায়। জেলার সৃজন-উৎসবের মধ্য দিয়ে তিনি পুরুলিয়ার সংস্কৃতিপরায়ণ মানুষদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করেন এবং তাঁদের উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। লেখকের কয়েকটি বিখ্যাত সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে 'সিঁদুরে কাজলে', 'মদনভেরি', 'সিরকাবাইদ' ইত্যাদি। এই সমস্ত উপন্যাসের মূল প্রেক্ষাপট পুরুলিয়ার প্রান্তীয় এলাকা।

লেখকের গল্প রচনার মূল সুরটি উন্মোচিত হয় যখন তিনি বলেন, -

> "গল্প আমার কাছে শুধু কাহিনির অনুষ্ঠান নয়।"[1]

আমরা তাঁর অধিকাংশ গল্পের মধ্যেই লেখক প্রদত্ত এই বক্তব্যের প্রতিফলন লক্ষ করি। কোনো গল্পেই তিনি নির্জলা কাহিনি রচনা করেননি। মানুষের দৈনন্দিন চলার পথের পরিসরটিকে জীবনরসে পরিপূর্ণ করে উপস্থাপন করেন। সেখানে কাহিনির পরিবর্তে জীবনের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

'উত্তরকথা' গল্প-সংকলনের ভূমিকায় তিনি বলেন, কোনো খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা অথবা কোনো সম্পাদকীয় অনুরোধে তিনি গল্প লেখেন না। তিনি বলেন, -

> "কোন গল্পই অর্থ উপার্জনের তাগিদে বা সম্পাদকের অনুরোধে যেমন লেখা হয়নি, তেমনই যশ-পিপাসা হেতু খ্যাতির আকাঙ্ক্ষাতে পণ্য-সম্ভারবাহী প্রতিদিন দেখা, প্রতিদিন হারিয়ে যাওয়া দৈনিক-সাপ্তাহিকেও প্রকাশিত হয়নি।"[2]

লেখকের এই মন্তব্যে একদিকে যেমন কোনো বাধ্যবাধকতার প্রতি মাথা নত না করার মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনই লেখক হিসেবে জনপ্রিয়তার প্রতিও তাঁর উদাসীনতার দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাস্তব জীবনেও দেখা যায় যে তিনি নিরিবিলি জীবনযাপনের প্রতি অধিক আগ্রহী— একথা তিনি বারংবার উল্লেখ করেছেন। নির্লিপ্ত সন্ন্যাসীর মতো সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও তিনি কোনো আড়ম্বরতা প্রদর্শন করেননি। তাই তাঁর গল্পের বয়ানে কোনো ধরনের অতিরিক্ত বর্ণনার প্রকাশ দেখা যায় না।

সৈকত রক্ষিতের সাহিত্যকর্মের 'স্টাইল অব মেথড' বা প্যাটার্নের কথাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লেখক স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন যে, তিনি চিরাচরিত লেখার পদ্ধতিতে গল্প বা উপন্যাস রচনা করেননি। প্রচলিত আখ্যানভিত্তিক রীতির প্রতি যে একধরনের আকর্ষণ সাধারণত দেখা যায়, সৈকত রক্ষিত সেই ধারা থেকে বেরিয়ে এসে আখ্যানের পরিবর্তে পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, -

> "মানুষ কি করছে তার বিচার করতে গেলে আগে দেখতে হবে সে কেন করছে, কোন অবস্থায়, কোন পরিবেশে তা করছে। গল্পে আখ্যান অংশের চেয়ে তার পরিবেশের গুরুত্ব আমার কাছে অনেকখানি।"[৩]

লেখকের এই মন্তব্যের মধ্যেই সাহিত্যে গবেষণাধর্মিতার লক্ষণ বিদ্যমান। কী ঘটছে তার চেয়ে কেন ঘটছে— এই প্রশ্নটি যখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন জীবনদর্শনের সত্যদিকটি আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

গল্পের নাম 'পাঘা'। শব্দটি একটি আঞ্চলিক শব্দ। এর অর্থ মূলত গবাদি পশুকে বেঁধে রাখার দড়ি। তবে শুধুমাত্র গবাদি পশুকে বেঁধে রাখার কাজেই এই পাঘা ব্যবহৃত হয় না; পাঘা আরও নানা কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রধানত গৃহপালিত পশুকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে দড়ি বা রশি ব্যবহৃত হয়, তাকেই গ্রামাঞ্চলীয় এলাকায় 'পাঘা' নামে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিশেষত দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গীয় ঝাড়খণ্ডি উপভাষাভাষী এলাকায় এই শব্দটির বহুল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। সৈকত রক্ষিতের গল্প 'পাঘা' শিরোনামে আসলে এক আঞ্চলিক মানুষের জীবনের সেই 'পাঘা'র কথাই বলা হয়েছে, যা তাকে জীবনযুদ্ধের লড়াইয়ে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে চলে। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গীয় মালভূমি এলাকার মানুষের জীবনে যে দুর্দশার পরিস্থিতি, তা তাদের একরকম পালিত পশুর মতোই ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। গৃহপালিত পশুকে যেমন গৃহকর্তা নিজের প্রয়োজনের তাগিদে নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়, তেমনই আমাদের জীবনের উপরেও এক অদৃশ্য রশি যেন আমাদের কেবলমাত্র প্রয়োজনের তাগিদেই নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়। 'পাঘা' গল্পের আলোচনায় আমরা সেই নিয়ন্ত্রিত জীবনের ছবিটিই স্পষ্টরূপে দেখতে পাই।

গল্পের নায়ক শামাউন একজন গ্রামীণ কৃষক। কৃষক হলেও সে যে দরিদ্র, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আঞ্চলিক লেখক সৈকত রক্ষিতের অধিকাংশ গল্পের নায়কই এই ধরনের সম্বোধনে সম্বোধিত হওয়ার যোগ্য। আলোচ্য গল্পের সামাউনও তার ব্যতিক্রম নয়। তার সেই দরিদ্র জীবনের অমোঘ নিরুপায়তার ছবিটিই এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রামীণ এই সাধারণ মানুষের জীবনের বাধ্যবাধকতার ছবিটি শুধুমাত্র সামাউনের জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়; এই ছবি আসলে গ্রামাঞ্চলীয় সাধারণ মানুষের জীবনের এক সামগ্রিক নিয়তির ছবি।

গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি একটি অতি মনোরম দৃশ্যের উপস্থাপনা। এই দৃশ্যে দেখা যায়, শামাউন তার গৃহপালিত গাই-গরুটিকে নিয়ে বাজারহাটে চলেছে বিক্রি করতে। সঙ্গে তার ছেলে আবুদান চলেছে হাট দেখার আনন্দে দুষ্টুমি করতে করতে। তাদের সেই হাটযাত্রার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক গ্রামীণ মাঠঘাটের একটি ছবিও এঁকেছেন। সেই বর্ণনা লেখকের কলমে এইরকম—

> "কাড়িয়র গ্রাম থেকে ঝালদার হাট অনেকটা রাস্তা। কম-সে-কম তিন মাইল। কিন্তু এই দূরত্বের কোনো একটানা পথ নেই। কখনো মাঠ—এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে জগদ্দল পাথর। আবার কখনো সংকীর্ণ মেঠো পথ এঁকেবেঁকে খেতে গিয়ে নেমেছে। আল ধরে পশ্চিমমুখী এগিয়ে গেলে পাহাড়-কোল। শামাউন আনসারি সরু আল ধরে হাঁটতে পারে না। সঙ্গে গাই-বাছুর আর ব্যাটা আবুদনকে নিয়ে এঁটেল মাটির পথ পেরিয়ে সে খেতের মাঝ বরাবর চলতে দিল। কেটে-ফেলা ধানের পুরোনো গোড়াগুলো তার তলপায়ে বিঁধতে থাকে।"[৪]

লেখকের এই বর্ণনায় ফুটে উঠেছে গ্রামীণ মুক্ত প্রান্তরের ছবি, যেখানে যেকোনো জীবনই মুক্তভাবে অতিবাহিত হতে পারে। কিন্তু শামাউন সেই প্রান্তরের মধ্য দিয়েই হেঁটে চলেছে হাটের পথে একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করতে। জীবনের প্রয়োজনে তাকে মুক্ত মাঠঘাটের উপর দিয়েই যেতে হচ্ছে জীবিকার তাগিদে। একটি পরস্পর-বৈপরীত্যের ছবি এঁকে লেখক দরিদ্র জীবনের সেই ভয়াবহ বাধ্যবাধকতার দিকটিকেই উপস্থাপন করেছেন।

গল্পের এই অংশে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শামাউন যখন তার গরুটিকে নিয়ে চলেছে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে, তখন তারই সঙ্গে সেই গাইয়ের দুই মাসের বাছুরটির উপস্থিতি এবং তার নিজের ছেলে আবুদানের মুক্ত প্রকৃতির প্রতি কৌতূহলী আকর্ষণ যেন শামাউনকেই ব্যঙ্গ করতে থাকে। তারা যেন শামাউনের মনস্তত্ত্বকেই উপস্থাপন করে মাত্র; কিন্তু তার অন্তরে জীবনের কঠোর তাগিদ যেন 'পাঘা' পরিয়ে তাকে নির্জীব করে দিয়েছে। তাই মুক্ত ও সজীব প্রকৃতিকে দেখার মতো সময় তার নেই। এসব তার কাছে অপ্রয়োজনীয় বিষয়। তার কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হল তাড়াতাড়ি হাটে গিয়ে তার গরুটি বিক্রি করা। সাংসারিক প্রয়োজনের তাগিদে সে যেন আবদ্ধ এক প্রাণী। তার কাঁধের উপর দায়িত্ব সেই সংসারকে রক্ষা করা। তাই ছেলেকে সে তাড়া দিয়েছে তাড়াতাড়ি পা চালানোর জন্য—

> "চ বাবু, রাগে রাগে চ দেখি।"[৫]

জীবনে প্রয়োজনের তাগিদ এতখানি যে কোনো কৌতূহলেও অন্যদিকে তাকানোর উপায় নেই। প্রয়োজনের হাটে তাকে পৌঁছাতেই হবে তাড়াতাড়ি; সেটিই অগ্রগণ্য বিষয়।

শামাউনের মনস্তত্ত্বটি আরও স্পষ্টভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে যখন সে হাটে এসে পৌঁছেছে। যে গরুটিকে সে হাটে বিক্রি করতে এসেছে, সেটি আসলে তার বিক্রি করার ইচ্ছা নেই। কিন্তু একরকম বাধ্যবাধকতার দ্বারা পীড়িত হয়েই তাকে এই কাজ করতে হচ্ছে। গরুটি যখন হাটের মধ্যে ভিড় দেখে ঢুকতে চায়নি, তখন অনেকেই তাকে রসিকতা করে বলে -

> "'মিঞা, গাই তুমার আজ ভিড়কে গেছে। হাটের ভিতরে সামাবেক নাই।"[৬]

সেই রসিকতার জবাবেই তার মনস্তত্ত্বের অভিমানটি প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। তাদের ঠাট্টার উত্তরে শামাউন বলে, -

> "ভিড়কে গেলেই আর কী করব বাপ।"[৭]

মাথায় গামছাটা শক্ত করে বাঁধতে বাঁধতে সে আরও বলে, -

> "দুধের গাই বিকতে কি হামারেই হিচ্ছা আছে?"[৮]

এই একটি উচ্চারণের মধ্যেই সামাউনের যাবতীয় হতাশা ও নিরুপায়তা যেন ঝরে পড়েছে। কিন্তু তার সেই নিরুপায়তার প্রতি কোনো সহানুভূতির অবকাশ লেখক রাখেননি। জীবনের বাস্তবতার কাছে কোনো সহানুভূতিই শামাউনের অবস্থাকে পাল্টাতে পারবে না বলেই হয়তো লেখক তা উপস্থাপন করেননি। বরং শামাউনকেই আরও প্রশ্নের মুখে ফেলে দেওয়া হয়েছে— তাহলে এই গাই-গরু নিয়ে সে হাটে এসেছে কেন? এর উত্তর শামাউনের কণ্ঠে আর জোগায়নি। অনেকেই যখন বলে যে, সে যদি গরু বিক্রি করতেই না চায়, তাহলে তা নিয়ে সে হাটে এসেছে কেন— এর কোনো উত্তর শামাউনের কাছে নেই। শুধু এইটুকু বোঝা যায় যে, এছাড়া তার হাতে আর কোনো উপায় নেই। এরই সূত্র ধরে তার মনের মধ্যে কিছু অভিমানও ফুটে ওঠে।

কোনো অতিরিক্ত কথন নয়, অতি অল্প ভাষায় এবং অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে লেখক শামাউনের সেই নিরুপায়তার ছবিটিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন—

> "একটা সস্তা অভিমানও যে হয় না তা নয়। ঘরে পালপোষ করা গাই, কান ফটফট্ করা তার চনফনে সুন্দর ধলা বাছুর আর আবুদনের শুকনো মুখ দেখে সেই অভিমান মুহূর্তে তীব্র হয়ে ওঠে। মনে হয়, খদ্দার বড়ো অবুঝ। বড়ো স্বার্থপর তারা।"[৯]

একদিকে কান ফটফটে সুন্দর বাছুরের প্রতি মমতা এবং অন্যদিকে আবুদনের শুকনো মুখ— একই সঙ্গে শামাউনের মনস্তত্ত্বের দুই বিপরীত প্রান্ত ও তার দ্বান্দ্বিক অবস্থাটিকে নির্মমভাবে প্রকাশ করে দেয়।

মনের মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠা সেই অভিমান নিয়েই সে এগিয়ে যায় হাটের একটি নির্দিষ্ট স্থানের দিকে। সেটাই তার আসল কাজ। তার মনের মধ্যে যেমন যন্ত্রণার দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, তেমনই সেই দ্বন্দ্বকে ভুলে যেতেও তার সময় লাগে না। তাকে এই গাই ও বাছুর বিক্রি করতেই হবে। সেই গাই ও বাছুর বিক্রি করে তাকে আবার একটি নতুন গরুর ব্যবস্থা করতে হবে। সেই কারণেই মূলত শামাউন ঝালদার হাটে এসেছে গাই-গরু বিক্রি করতে।

মনের মধ্যে অভিমান হয়তো তার আছে, কিন্তু সেই অভিমানকে জিইয়ে রেখে তার কোনো লাভ নেই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই অভিমানের জন্য কোনো উপরওয়ালার প্রতি তার ক্ষোভ নেই। কারণ মনের মধ্যে থাকা এই অভিমান

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 107 - 116
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আসলে সম্পূর্ণই তার নিজস্ব। সেখানে তার পথ রয়েছে খোলা। কিন্তু সেই পথেও তাকে এই অভিমান ভুলে গিয়েই কাজ করতে হবে। এখানে আসলে শামাউনের বাস্তবিক পরিস্থিতিটিই উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে। লেখকের মুন্সিয়ানায় সেখানে শামাউনকে দেখানো হয়েছে একজন স্বাভিমানী ব্যক্তি হিসেবে, যিনি প্রয়োজনীয়তার জালে গোড়া থেকে জড়িয়ে পড়েছেন। তার মন হয়তো এই সমস্ত করতে চায় না, কিন্তু কাজটি তাকে করতেই হবে। তার মন হয়তো এই গাই ও বাছুরটিকে বিক্রি করতে চায় না, কিন্তু তাকে তা করতেই হবে। নিয়তির মতোই নিজের অভিমানকে তাই চাপা দিয়েছে সে; এগিয়ে গিয়েছে হাটের দিকে।

হাটে ঢুকেই শামাউন এক দালালের খপ্পরে পড়ে। শামাউন এমন নয় যে জানে না ইউসুফ একজন দালাল। পরিচয় হতেই সে জেনে গিয়েছে যে, ইউসুফ ব্যবসায় নিজে টাকা খাটায় না; ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যিখানে দাম-দর নিয়ে কথাবার্তা চালিয়ে উভয় পক্ষ থেকেই কিছু আদায় করে নেওয়ার তাগিদ থেকেই সে এই ব্যবসা করে। তার কাছেই শামাউন নিজের গাই ও বাছুর বিক্রি করা মনস্থ করে।

এ এক অতি সাধারণ বিষয়। পশু বিক্রির হাটে এই ধরনের মধ্যস্থ ব্যক্তিদের হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। জীবনের ক্ষেত্রেও তাই। এখানে যেমন ভালো ও মন্দ মানুষ রয়েছে, তেমনই রয়েছে মধ্যস্থ মানুষও। এরা দুই পক্ষের মন যুগিয়ে নিজের আখের গুছিয়ে নিয়ে চলে। সেটাই তাদের বেঁচে থাকার উপায়। শামাউন তাই ইউসুফ সম্বন্ধে তেমন কিছু ভাবে না। গল্পের গতিতেও ইউসুফের আগমনে তেমন কোনো নাটকীয় মোড় তৈরি হয় না। পশু কেনাবেচার হাটে এই ধরনের মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে তাই অতিরিক্তভাবে ভাবার কিছু নেই। শামাউন যেমন গরু বিক্রি করতে এসেছে, তেমনই ইউসুফ এসেছে তার মধ্যস্থতার কাজটি করতে।

এখানে জীবনের চাকার 'পাঘা'-য় প্রত্যেকটি মানুষই একটি নির্দিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ। সেখান থেকে কারোরই মুক্তি নেই। তার উপর ভিত্তি করেই নির্মিত হয় সকল মানুষের বেঁচে থাকার জন্য জীবন ও জীবিকার প্রসঙ্গ। পশু কেনাবেচার হাটে পশু যেমন কেনা হয়, তেমনই বেচাও হয়। কেনাবেচার হাটে তাই পশুর দাম-দরও হয়। লেখক সৈকত রক্ষিতের গল্পে কোনো কৃত্রিম ব্যঞ্জনা নেই; কেবল রয়েছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের এক বাস্তব ও নির্লিপ্ত প্রতিফলন।

শামাউন হাটে এসেছে গরু বিক্রি করতে। হাটে এসে যেমন কেনাবেচার দাম নিয়ে কথাবার্তা হয়, তেমনই এখানে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সেই দাম-দর নিয়ে নানা কাটাছেঁড়াও হয়। ফলে কখনো জিনিসের দাম কমে, আবার কখনো বেড়ে যায়। তারই মধ্যে নিজের প্রাপ্য দামটি তুলে নিতে হয় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই। এখানেও দেখা যায়, লক্ষণ নামে এক খরিদ্দার যখন শামাউনের গরুর দাম জানতে চায়, তখন শামাউন যে দাম বলে তা লক্ষণের পছন্দ না হওয়ায় সে সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হয়।

এখানে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কেনাবেচার ব্যাপারে শামাউন বেশ খানিকটা কাঁচা। এমন আনাড়ি লোক বাজারে এলে ঠকতে হয়। শামাউন যখন লক্ষণের কাছে তার গরুর দাম বলে, তখন লক্ষণ সেই দাম শুনে সেখান থেকে চলে যেতে চায়। শামাউন সঙ্গে সঙ্গে তাকে থামানোর চেষ্টা করে। কিন্তু এটি একজন বিক্রেতার দস্তুর নয়। খরিদ্দারকে অতিরিক্ত মান দিলে সেখানে ঠকে যাওয়ার ভয় থাকে। সে নিজে যেহেতু একটি দাম বলেছে, এরপর অপর পক্ষের দাম বলার পালা। কিন্তু তা না করে খরিদ্দার যদি চলে যেতে চায়, তাহলে তাকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে নিজের কাজে মন দিতে হবে। এইরকমই অন্তত ইউসুফের শিক্ষার মধ্যে শামাউনকে শিখতে হয়। ইউসুফ বলে, -

> "কারবারি মানুষকে দম ধরতে হয়। ছউ শালা যেমনে গরম দেখাছে, তুমোও তেমনে দেখাও।"[১০]

শামাউনকে সে রীতিমতো ধমকের সুরে সতর্কতামূলক শিক্ষা দিয়ে বলে, -

> "এক কথায় দাম কমাবে ক্যানে হে? ক্যানে তুমি দাম কমাবে?"[১১]

কারবারি মানুষকে এত তাড়াতাড়ি খরিদ্দারের কাছে নত হলে চলে না। তাকে নিজেকেও নিজের দাম সম্বন্ধে শক্ত হতে হবে। তা যদি না হয়, তাহলে ঠকতে হবে। ইউসুফের কাছে এসব শুনে শামাউন অনেকটা ভরসা পায় যে, ইউসুফ অন্তত তার পক্ষের লোক। কিন্তু ইউসুফ একজন মধ্যস্থ ব্যক্তি। তার কাজই হল উভয় পক্ষের হয়ে কথা বলা। এটা যদি সে না করে, তাহলে তার কপালে উপার্জন জুটবে না।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 107 - 116
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

OPEN ACCESS
IF 8.111

শামাউন শুধু নিরুপায় ব্যক্তি নয়, সে আসলে জীবনের কেনাবেচার বাজারে এক আনাড়ি মানুষ। একদিকে যেমন সে একটি হিসেব করে চলে, তেমনই তাকে বিসর্জন দিতে হয় অন্যদিকটি। সে যদি একদিকে হিসেব করে চলে, তাহলে অন্যেরা তাকে অন্যদিকের হিসেব দেখিয়ে ঠকিয়ে নেবে। এমনই তার কপাল। এই সমস্ত আনাড়ি লোকেরাই জীবনের কাছে বারংবার লাথি খায়, কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোনো উপায় খুঁজে পায় না। শামাউন সেই ধরনেরই একজন আনাড়ি প্রকৃতির মানুষ। সেখানে ইউসুফ থেকে শুরু করে খরিদ্দার লক্ষণ— সকলেই তাকে ঠকিয়ে নিতে পারে। আলোচ্য অংশে সেই ধরনেরই আবহটি উপলব্ধি করা যায়।

শামাউনের সাংসারিক শিকলটি কতখানি আঁটোসাঁটো করে বাঁধা, তা লেখকের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে—

> “এই বয়সেও দায়িত্ব কম শামাউনের? ঘরে বিবি আছে। দু-টা বিটি আছে। বড় বিটির বিহা দিয়েছে পুরুলিয়ার কসাই মহল্লাতে। জামাই কাজ করে সেখানে। আলকাসের সাবুন ফেকটিরিতে। ছোটো বিটি সাত-আট সালের। ব্যাটা বলতে আবুদন। নিজেকে নিয়ে এই চার-চারটা পেট ভরসা করে আছে তার একার কামাইয়ের ওপর। রুজি-রোজগারের ধান্দায় শেষদিন তক্ তাকে পসিনা ছুটিয়ে যেতে হবে। তবু, মাঝে মাঝে নিরাশ হয়ে যায় শামাউন।”[১২]

এই চার-চারটি পেট পোষার জন্য তার যে সামান্য জমি রয়েছে, তা দিয়েই কোনোভাবে চলে যায়। সেই জমি চাষ করতে না পারলেই তার বিপদ। তাই তাকে জমি চাষ করতেই হবে। আর জমি চাষ করার জন্য তাকে লাঙল চালাতে হবে। ভাড়ায় লাঙল চালানোর মতো ক্ষমতা তার নেই। বাড়িতে লাঙল চালানোর জন্য একটি গরু রয়েছে, কিন্তু তারই সঙ্গে আরেকটি গরু কেনার জন্যই সে বাজারে এসেছে বাড়িতে থাকা একটি গাই ও বাছুর বিক্রির উদ্দেশ্যে। এই গরুটি সঠিক দামে বিক্রি হলেই তবেই সে আরেকটি গরু কিনতে পারবে। গাই ও বাছুরের উপযুক্ত দাম যদি সে না পায়, তাহলে তার সেই পরিমাণ টাকা হবে না, যা দিয়ে সে বলরাম মাহাত কিংবা পরিজন হাড়ীর কাছ থেকে আরেকটি গরু কিনতে পারে। লেখক দেখিয়েছেন যে, শামাউনের কাঁধে অনেক দায়িত্ব। বাড়িতে যে চারটি মানুষ এখন বিদ্যমান, তাদের সারা বছরের খাবারের জোগাড় তাকে করতে হবে। তার কাছে যে সামান্য জমি রয়েছে, সেখান থেকেই সে চাষ করে সংসারের খাদ্যের ব্যবস্থা করে। আর সেই চাষের জন্যই তার আরেকটি গরুর প্রয়োজন— লাঙলের উল্টোদিকে জোত বাঁধার জন্য। তার জন্য অন্ততপক্ষে পাঁচশো টাকার প্রয়োজন। তা না হলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে না এবং নতুন গরু কেনাও সম্ভব হবে না।

লেখক এখানে জানান যে, শামাউনের একার উপার্জনের উপর চারটি পেট নির্ভর করে আছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাকে তাদের জন্য ঘাম ঝরিয়ে যেতে হবে। এটি গ্রামীণ খেটে-খাওয়া মানুষের এক অতি সাধারণ ছবি। কৃষির উপর নির্ভর করে যেসব মানুষের জীবন অতিবাহিত হয়, তাদের বাস্তব জীবনচিত্রই এখানে ফুটে উঠেছে। লেখক বলেন যে, শামাউনের অনেক দায়িত্ব। সেই দায়িত্বের ফাঁস তাকে সারাজীবন বহন করে চলতে হবে। তার থেকে কোনো নিস্তার নেই, কোনো উপায়ও নেই।

এমন অবস্থায় হঠাৎ করেই যখন তার চাষের লাঙলের একটি গরু বনের মধ্যে বিষপাতা খেয়ে মারা যায়, তখন তার মাথায় যেন বজ্রাঘাত নেমে আসে। খোদাতাল্লাকে আর্তনাদ করে নালিশও জানায় সে। কিন্তু সেই নালিশ করেই বা কী হবে? তিনি তো আর কোনো ব্যবস্থা করে দেবেন না। যা কিছু করার, তাকেই করতে হবে। তাই একসময় সেই আর্তনাদ বা খোদাতাল্লার কাছে নালিশ করাও সে ছেড়ে দেয়। নিজে খেটে খাওয়ার জন্য আবার কোমর বেঁধে প্রস্তুত হয়ে যায়। এভাবেই নিয়তির আঘাতকে মাথায় নিয়ে শামাউন আবার বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সামিল হয়।

এই লড়াইয়ের জন্য তাকে কোনো ভাবনার অবকাশ দেয়নি কেউ। এমনকি সেই অবকাশের প্রয়োজনও অনুভব করেনি শামাউন। সমস্ত কষ্টকে ভুলে গিয়ে তাকে ভাবতে হয়েছে আগামী ভবিষ্যতের কথা। এখানে শামাউনের আত্মসমীক্ষণের দিকটি উদ্ঘাটিত হয়েছে। সেখানে দেখা যায় যে, শামাউন নিয়তির দ্বারা আবদ্ধ হয়েও সেই নিয়তির প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েনি। শেষপর্যন্ত সমস্ত দায়িত্ব যে তাকেই বহন করতে হবে, সেই সত্য উপলব্ধি করেই সে এগিয়ে গিয়েছে ভবিষ্যৎ পদক্ষেপের দিকে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 107 - 116
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আসলে মানুষের জীবনের এটাই একমাত্র ধর্ম। জন্মগ্রহণের পর থেকেই কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্যই তাকে লড়াই করে যেতে হয়— সে যেভাবেই হোক না কেন। গ্রামের মানুষদের ক্ষেত্রে এই লড়াইয়ের প্রসঙ্গটি আরও কঠিনভাবে সত্য। তাদের কাছে অন্য কিছু ভাবার অবকাশ পর্যন্ত নেই। কেবলমাত্র লড়াই করে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নেই। শামাউন তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

'পাঘা' প্রসঙ্গে লেখক এখানে আরেকটি দিকের কথাও তুলে ধরেছেন। ঝালদার হাটে পশ্চিমা ব্যবসায়ীরা আগেই এসে ভিড় জমায়। লেখক বলেন—

> "একেক লোক দশ-বিশ গোরু শিং-এ তেল মাখিয়ে গায়ে রঙের ছোপ মেরে নিয়ে আসে। এমুড়ো-ওমুড়ো রশি ঝুলিয়ে ফুট-দেড়ফুট অন্তর রশির গায়ে তাদের পাঘা বেঁধে দেয়। একটা গরু সামনে-পিছনে এগোলে, শিকলের মতো, তার টান পড়ে অন্যদের ওপর। এমনি সাজাবার গুণে খদ্দার আকৃষ্ট হয়।"[১৩]

সুন্দর শৃঙ্খলায়িত জীবনের জন্য 'পাঘা' এখানে নতুন এক ব্যঞ্জনাকে তুলে ধরে।

মানুষের সমাজেও একইভাবে এই ধরনের এক অদৃশ্য 'পাঘা'য় প্রতিটি মানুষের জীবন আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তাকে যদি আমরা সমাজ নাম দিয়ে থাকি, তাহলে অত্যুক্তি করা হয় না। সমাজের প্রতিটি মানুষই পরস্পরের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের দ্বারা আবদ্ধ। এই 'পাঘা' থেকে একজন মানুষের পালানোর কোনো উপায় নেই। একজন 'পাঘা' খোলার চেষ্টা করলে তার জন্য স্বাভাবিক নিয়মেই টান পড়ে অপর আরেকজনের উপর। এক অমোঘ নিয়মে যেন সকল মানুষ পরস্পরের সঙ্গে রশিবদ্ধ হয়ে সাজানো-গোছানো অবস্থায় রয়েছে।

এই অংশে গরু বাঁধা রশি বা 'পাঘা'র ব্যঞ্জনাটি আরও বিস্তৃত হয়ে যায়। 'পাঘা'র বন্ধন কেবলমাত্র শামাউন বা কোনো একক মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; এটি একটি সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধতার মূলেও সমানভাবে প্রযোজ্য। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সমাজ এখানে পশু কেনাবেচার হাটের সঙ্গে তুলনীয় হয়ে ওঠে।

একদিকে শামাউন হাটের চারিদিকের পরিবেশ দেখে যেমন আনন্দিত হয়ে ওঠে, তেমনই আবার সেই আনন্দের মধ্য দিয়েও তার শুকনো মুখখান বিবর্ণ হয়ে যায়। শামাউনের মানসিক অবস্থার এই দ্বৈতভাব একজন বিপদগ্রস্ত মানুষের নয়, বরং আশঙ্কাজড়িত একজন মানুষের। এত বড় পশুহাটের রমরমার মধ্যে তার একটি গরু বিক্রি হবে কি না— সেই ভাবনাই হয়তো তাকে পীড়িত করে। এই অবস্থায় ইউসুফ তাকে ভরসা দেয় যে, সে শামাউনের গরু বিক্রি করে দেবে। কিন্তু তাতেই থেমে না থেকে, যদি নিতান্তই বিক্রি করতে না পারে, সেই আশঙ্কায় সে নিজেই হাঁকডাক শুরু করে দেয়। শামাউন যে জীবনের লড়াইয়ের ময়দানে কারো উপর ভরসা না করেই এগিয়ে চলেছে এবং সেটাই তাকে করতে হবে— তা সে বোঝে। তাই দেখা যায়, বিপদের দিনে যখন তার গরু মারা গিয়েছিল, তখন যেমন সে খোদাতাল্লার উপর আস্থা না রেখে নিজের কাজে মন দিয়েছিল, তেমনই সেই মনস্কতার বহিঃপ্রকাশ এখানেও ঘটেছে। ইউসুফের উপর সম্পূর্ণ ভরসা না করে তাই নিজেই খরিদ্দার ডাকার জন্য হাঁক দিতে শুরু করে। একজন স্বাধীনচেতা ও স্বাধীনভাবে কর্ম সম্পাদনকারী মানুষ হিসেবে শামাউনকে এখানে আমরা দেখতে পাই।

দেখা যায়, শামাউন আনাড়ি হওয়ার কারণে খরিদ্দারেরা তার গরুর দাম বারবার কমিয়ে নিয়ে যায়। শামাউন বুঝতে পারে না যে তারা তাকে ঠকাচ্ছে কি না। কিন্তু হাট মানেই চটকদারি। সেখানে শামাউন সাদাসিধেভাবে যেভাবে গরু বিক্রি করতে এসেছে, তাতে তার গরুর দাম না ওঠাই স্বাভাবিক। চারিদিকে যেখানে সাফসুতরো, শিঙে তেল দেওয়া ঝকঝকে গরুর দল সাজানো-গোছানো অবস্থায় ব্যবসায়ীরা নিয়ে এসেছে, সেখানে শামাউনের গরু বড়ই বেমানান। তাই তার গরুর দাম যে প্রত্যেক খরিদ্দারই কমিয়ে দিচ্ছে, তাতে তার নিজেরই দুর্বলতা ফুটে উঠেছে।

শামাউন ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের পুরুলিয়া জেলার একজন মানুষ। এখানকার মানুষের জীবনের পাঁচালি মূলত লেখক এই গল্পে উপস্থাপন করেছেন। তিনি যেভাবে পাহাড়-জঙ্গলঘেরা এই মালভূমি এলাকার মানুষের জীবন ও জীবনের ছবিকে তুলে ধরেন, তাতে স্পষ্ট হয় যে এই অঞ্চলটিকে লেখক হাতের তালুর মতো চেনেন। 'মাটির মানুষ' বলে আমরা যাদের সম্বোধন করি, তাদের এতখানি বাস্তব চিত্র অঙ্কন করা ততক্ষণ সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তাদের সঙ্গে আন্তরিক

মেলবন্ধনের অবকাশ থাকে। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে ১৯৭০-এর দশকে লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী সাহিত্যিকদের যে আহ্বান করেছিলেন তার কথা—

> "গ্রামে ও শহরে সাধারণ জীবনসংগ্রামী মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হন। বারবার যান তাদের মধ্যে। দেখুন তাদের জীবন। তাদের জীবন, সঙ্গ ও উপস্থিতিই লেখককে অনেক কিছু দিতে পারে।"[১৪]

বর্তমান লেখক সৈকত রক্ষিত সেই আহ্বানেরই একজন সৈনিকরূপে যেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এই জেলারই অন্তর্গত এই ঝালদা পশুহাট। সেখানেই শামাউন এসেছে তার গরুটি বিক্রি করার জন্য। সেই হাটেরই একটি চারিত্রিক ছবি এখানে লেখক তুলে ধরেছেন।

গ্রামাঞ্চলীয় মানুষের জীবনে কী সুখ, কী দুঃখ— তা বাইরে থেকে সহজে উপলব্ধি করা যায় না। তারা একই সঙ্গে সুখ ও দুঃখ উভয়কেই সমান মর্যাদা দিয়ে চলে। ছোট ছোট সুখ যেমন তাদের কাছে অমূল্য আনন্দের বিষয়, তেমনই সেই ক্ষুদ্র সুখানুভূতির মধ্য দিয়েই জীবনের অনেক দুঃখকে তারা এক ধরনের উপভোগ্য করে তোলে। সুখী মানুষের দল কেবল সুন্দর বাড়িতে দামি আসবাবের মধ্যেই নিহিত থাকে না। আমাদের গ্রামাঞ্চলীয় মানুষদের দুঃখের মধ্যেও এক অমোঘ সুখের আবেশ বিদ্যমান থাকে। হাটে-বাজারে যে সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদ অনুভব করে, সেই সমস্ত মানুষও যে সুখ অনুভব করে, তার মূল্যও কম নয়।

ঝালদার হাটে শামাউন তার পালিত গরুটিকে বিক্রি করে দিতে এসেছে। তাতে একদিকে যেমন তার নিরুপায়তা প্রকাশিত হয়, তেমনই আবার অপরদিকে রয়েছে তার জীবনের বেঁচে থাকার একটি স্বপ্ন। এই গরু বিক্রি করে সে চাষের জন্য নতুন একটি গরু কিনবে। এই দোলাচলের মধ্য দিয়েই গ্রামীণ সাধারণ মানুষগুলো জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তারই মধ্যে সুখ ও দুঃখ মিলেমিশে গাঁথা হয়ে থাকে। ভরন্ত হাটের মধ্যে ইউসুফ ও শামাউনের চা-পানের মধ্য দিয়ে লেখক সেই সুখের একটি টুকরো ছবি অঙ্কন করেছেন।

শামাউন ও ইউসুফ যখন চা খাচ্ছে, তখন শামাউনের ছেলে আবুদান তার খিদের কথা বলে জিলিপি খাবার জন্য বায়না ধরে। শামাউন বোঝে ছেলের খিদে পেয়েছে। তার নিজেরও খিদে পেয়েছে, কিন্তু খিদে তার যেন মরেই গেছে। খিদের যন্ত্রণা ও দুঃখ তার কাছে নতুন কিছু নয়। এমন বহু দিন তার উপবাসে কেটেছে, যখন তার খিদে পেটের মধ্যেই মিলিয়ে গিয়েছে। সেসব কথা আবুদান বোঝে না। সেসব কথা ভাবতে ভাবতেই শামাউন ও ইউসুফ চা খায়, আর আবুদানকে জিলিপি কিনে দেয়। শামাউনের জীবনে সুখ ও দুঃখের মেলবন্ধন এভাবেই গাঁথা হয়ে থাকে। তারই মধ্যে চলে তার সংসার।

আবুদানের খিদে পেয়েছে। ছোট ছেলে বলেই তার খিদে পেয়েছে, এমনটা নয়। সেই সকালবেলা ফজরের নামাজের সময় তারা রওনা দিয়েছে। তারপর থেকে আর খাবার খাওয়ার সময় হয়নি। সুতরাং শুধুমাত্র আবুদানের নয়, শামাউনেরও খিদে পেয়েছে। কিন্তু একটি ভবিষ্যৎহীন ও পীড়াদায়ক জীবনের কথা চিন্তা করে শামাউন খিদেকে খামোশ করে দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছে। আবুদানের সেই ক্ষমতা নেই। তাই হয়তো শামাউন আবুদানের খিদেকে এড়িয়ে যাওয়ার মতলবেই হাটের অন্যদিকে চোখ ঘোরায়।

লেখকের বর্ণনায় হাটের শত শত নোংরা আবহাওয়ার মধ্যেও শামাউনের মনের মধ্যে সেই পেটের খিদের কথাটি চাপা পড়ে যায়নি। শামাউন নিজের সংযমের নামে খিদেকে হয়তো চেপে রাখার কাজটি করে গিয়েছে, কিন্তু তার সেই খিদে যে কতখানি গভীর, তাকে লেখক চাপা দিতে পারেননি। সমস্ত হাটের কোলাহলের মধ্যেও শামাউনের পেটের খিদে যেন অবাধ্য হয়ে উঠেছে লেখকের কলমে।

শামাউন জীবনের দুর্দিনের কথা ভেবে খিদেকে জয় করার যে সংযম আয়ত্ত করেছে, তাও যেন এক ধরনের ছদ্মবেশ। আবুদানের খিদের প্রশ্নে সেই সত্যটি লেখকের বর্ণনায় উদ্ঘাটিত হয়ে গিয়েছে। শামাউন যতই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, হাটের সমস্ত শব্দ, ঘামের গন্ধ, ভিজে নোটের গন্ধ ছাপিয়ে জেগে রয়েছে সেই খিদে। এই সত্যকে অস্বীকার করা যায় না বলেই লেখক এই ধরনের একটি বর্ণনার মধ্য দিয়ে তা উপস্থাপন করেছেন।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 10
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 107 - 116
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শামাউনের গরু যখন বিক্রি হচ্ছিল না, তখন ইউসুফের মধ্যস্থতায় সেই প্রথম খরিদ্দার লক্ষণকে আবার ধরে নিয়ে আসে সে। তারপর খুবই অল্প দামে শামাউনের গরুটি বিক্রি হয়ে যায়। শামাউন যে গরুর দাম করেছিল সাতশো টাকা, সেই গরু এখন লক্ষণ কিনে নেয় মাত্র তিনশো পঁচিশ টাকায়— অর্ধেকেরও কম দামে। সরাসরি ঠকে যাওয়ার পরেও এখন শামাউনের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে ভবিষ্যতের চিন্তা। এই তিনশো পঁচিশ টাকা দিয়ে সে কি অন্য আরেকটি গরু কিনতে পারবে?

শামাউন আসলে গরু বিক্রি করতে এসেছিল লাঙল চালানোর জন্য একটি জোত-গরু কেনার উদ্দেশ্যে। সে গরুর দাম সে জেনেছিল মোটামুটি পাঁচশো টাকা। তার কমে তা পাওয়া যাবে না। তাই সে গাই-বাছুর সমেত গরু বিক্রি করে সেই টাকা তোলার জন্যই হাটে এসেছিল। কিন্তু মাত্র এই তিনশো পঁচিশ টাকায় তার কী হবে? সেটাই এখন তার চিন্তা। এখন সে কী করবে? লেখক তার নিরুপায়তার ছবিটি এইভাবে তুলে ধরেছেন—

> “দু-দাঁতের একটা ছোটোখাটো গরু? নাকি জোয়ালের অন্যপাশে ব্যাটা আবুদনকে জুড়ে সে খেতে লাঙল ঘুরিয়ে যাবে?”[১৫]

এই কথা ভেবে শামাউনের চোখে জল এসে যায়, কিন্তু তার কিছুই করার নেই। এই করুণ পরিস্থিতিই শামাউনের সামগ্রিক অবস্থাটিকে উপস্থাপন করে দেয়।

সেই অল্প দামে শামাউন গরু বিক্রি করে বাড়ির দিকে রওনা দেয়। হাটের যে মাশুল বা টিফিন খাওয়ার টাকা, তা সে দিতে পারেনি। তার জন্য ইউসুফ অবশ্য তাকে পথও বলে দিয়েছে। কিন্তু শামাউনের তাতেই বা আর লাভ কী? সে একজন গরিব মানুষ। শেষ পর্যন্ত চোখের জল নিয়েই সে হাট থেকে বাড়ি ফেরে।

গরু বিক্রির পর সেই গরুর ‘পাঘা’টি কিন্তু সে খুলে নেয়। ছেলে আবুদানকে নিয়ে ও সেই ‘পাঘা’টি সঙ্গে করেই সে বাড়ির পথে রওনা দেয়। গরু বিক্রি হয়ে গেলেও তার ‘পাঘা’টি এখানে যেন জীবনেরই সাথী। অমোঘ নিয়তির মতো তা তার সঙ্গেই থেকে যায়। যেমন করে তার সন্তান চলেছে তার সঙ্গে, তেমনই শিকলের মতো সেই ‘পাঘা’- টিকেও ছেড়ে যেতে পারেনি সে।

Reference:

১. রক্ষিত, সৈকত, উত্তরকথা : সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ, পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৫, কলকাতা–৭০০০০৯, পৃ. ৬
২. রক্ষিত, সৈকত, উত্তরকথা : সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ, পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৫, কলকাতা–৭০০০০৯, পৃ. ৬
৩. রক্ষিত, সৈকত, উত্তরকথা : সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ, পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৫, কলকাতা–৭০০০০৯, পৃ. ৬
৪. রক্ষিত, সৈকত, উত্তরকথা : সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ, পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৫, কলকাতা–৭০০০০৯, পৃ. ২৩
৫. রক্ষিত, সৈকত, উত্তরকথা : সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ, পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৫, কলকাতা–৭০০০০৯, পৃ. ২৪
৬. রক্ষিত, সৈকত, উত্তরকথা : সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ, পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৫, কলকাতা–৭০০০০৯, পৃ. ২৪
৭. রক্ষিত, সৈকত, উত্তরকথা : সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ, পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৫, কলকাতা–৭০০০০৯, পৃ. ২৪
৮. রক্ষিত, সৈকত, উত্তরকথা : সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ, পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৫, কলকাতা–৭০০০০৯, পৃ. ২৪

৯. রক্ষিত, সৈকত, উত্তরকথা : সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ, পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৫, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ২৫

১০. রক্ষিত, সৈকত, উত্তরকথা : সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ, পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৫, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ২৬

১১. রক্ষিত, সৈকত, উত্তরকথা : সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ, পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৫, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ২৬

১২. রক্ষিত, সৈকত, উত্তরকথা : সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ, পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৫, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ২৮

১৩. রক্ষিত, সৈকত, উত্তরকথা : সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ, পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৫, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ২৮

১৪. আচার্য, অনিল (সম্পা.), সত্তর দশক [প্রথম খণ্ড], অনুষ্টুপ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, চতুর্থ মুদ্রণ ২০২০, পৃ. ৭৩

১৫. রক্ষিত, সৈকত, উত্তরকথা : সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ, পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৫, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৩৪